BENGALI HONOURS

Semester- II

CC-3rd paper বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

Presented

by

Minal Ali Mia

Asst. Professor

Department of Bengali

Alipurduar Mahila Mahavidyalaya

Topic : কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। ধ্রুপদী কথাশিল্পী, নিম্নবর্গের গণমানুষের কথাকার, সজীব জীবনের সচিত্রশিল্প সাধক এমনতর বহুমাত্রিক অভিধায় সম্মানিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনঘনিষ্ঠ লেখনী তাকে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই (নানা মতান্তরসহ) জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত শক্তিমান এই কশাশিল্পী আমাদের মনে সদা জাগ্রত আছেন তাঁর মৌলিক সৃষ্টিরসের মাধ্যমে। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হলেও বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার জন্য তিনি চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। কালজয়ী সাহিত্যসাধক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘কবি’ ‘সপ্তপদী’ ‘জলসাঘর’, ‘গণদেবতা’, ‘রাইকমল’ সহ আরো একাধিক অমর সৃষ্টি আমার অসম্ভব প্রিয় সাহিত্যশিল্প।

২.

ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, তারাশঙ্কর তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের বিষয়। তাঁর লেখায় বিশেষ ভাবে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। সেখানে আরও আছে গ্রাম জীবনের ভাঙনের কথা, নগর জীবনের বিকাশের কথা। মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম অনুভূতিকে তিনি এমনভাবে

তার রচনায় বর্ণনা করেছেন যে, যে কোনো পাঠকের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল। আর এসব কারণেই তার সাহিত্যকর্ম পাঠকের হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে আছে, থাকবে। তারাশঙ্করের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের বীরভূমের লাভপুর গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে ১৮৯৮ সালে।

৩. সাহিত্য সমালোচকগণের মতে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙলা কথাসাহিত্যের এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম। বাংলা কথাসাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বি শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তিনি যথাযথ উত্তরসূরী। বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত তিন বন্দ্যোপাধ্যায় – এর মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকোবিদ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আলোকস্পর্শ যখন ক্রমশ বিলীয়মান, যখন শরৎচন্দ্রের দিনও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যখন দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে একটা অস্থিরতার স্পর্শ, এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে তারাশঙ্করের আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তারাশঙ্করের লেখনীর স্পর্শে বাংলা কথাসাহিত্য আবার নতুনভাবে আলোকিত হয়।একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের আগ্রাসী তৎপরতা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে মানব অস্তিত্বকে; নৈরাজ্য-নৈরাশ্য-অনিশ্চয়তা-ক্লেদ-শঙ্কা আর মনস্তাপে বৃহদাঙশ মানুষ খনন করেছে আত্মপ্রতারণার নির্বিঘ্ন বিবর।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তিনজনের জগৎ আলাদা, তবে শক্তিতে তাঁরা স্বগোত্রীয়। উপন্যাসের বিশ্বপটভূমির কথা মনে রেখেই বলা যায়, তাঁরা অসাধারণ ঔপন্যাসিক। মানিকের পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা; তারাশঙ্করের হাসুলিবাঁকের উপকথা, গণদেবতা; বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, আরণ্যক অর্পূব রচনা। মানিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের যোগ, তারাশঙ্করের আঞ্চলিক জীবনবোধ-সামন্তচেতনা, বিভূতিভূষণের জীবন-প্রকৃতি-দর্শন বাংলা উপন্যাসকে ধনী করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের জগৎও নিজ আলোয় উদ্ভাসিত; নারীজীবন-সামন্ত চরিত্র নিয়ে তাঁর আবেগতপ্ত ভাষা আমাদের এক মদির রণজগতে নিয়ে যায়। তবে উপন্যাসের শক্তির বিবেচনায় তাঁকে ন্যূন করে দেখতেই হয়।তারাশঙ্কর চার দশকের বেশিকাল ধরে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৭১ সালের মৃত্যু অবধি ১টি কাব্যগ্রন্থ, ৬৫টি উপন্যাস, ২০০-এর অধিক ছোটগল্প, ১২টি নাটক, অস্যংখ্য প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩২), জলসাঘর (১৯৩৮), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), কবি (১৯৪৪), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩) ইত্যাদি ধ্রুপদী আঙ্গিকের উপন্যাস লিখে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তিনি বিশেষ আসন লাভ করেছেন।

৪.

‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’ তারাশঙ্করের প্রথম ধারার শেষ পর্বের মহাকাব্যিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর ভূমি নির্ভর আভিজাত্য বোধে জারিত জীবন ব্যবস্থার মাঝে বিত্ত-মর্যাদা-সচেতন অর্থদৃপ্ত অহমিকার অনুষঙ্গকে উপস্থাপন করেছেন। ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’-এর একটা অনুষঙ্গ তাঁর নিজের জীবন কাহিনীরই যেন প্রতিচ্ছবি। উচ্চকোটির জীবন আর নিম্নকোটির জীবনযাত্রার সংঘাত এই উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে তারাশঙ্কর কৌম সমাজের গোষ্ঠী জীবনকে বিষয়ভুক্ত

করেছেন। উপন্যাসটিতে রয়েছে সমান্তরাল দুটি কাহিনী। বাঁশবাদি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কোপাই নদীর বিখ্যাত হাঁসুলি বাঁকের কাহার সম্প্রদায়ের সুসংহত জীবনের পতন, কৃষি নির্ভর জীবনের পরিসমাপ্তি ও কাঁশবন ঘেরা উপকথার হাঁসুলি বাঁক বিরানভূমি পরিণত হওয়ার কাহিনী 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা।' কাহার সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ও বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক সমাজের যন্ত্রকলে তাদের দাসে পরিণত হবার কাহিনী 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। দ্বিতীয় ধারার উপন্যাসের প্রসঙ্গে নাম করতে হয় 'মন্বন্তর'-এর । এ উপন্যাস অনেকাংশে প্রগতি আন্দোলনের (১৯৩৫-৫০) দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি গ্রন্থিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশবিভাগ প্রাক পর্বের রাজনৈতিক, সামাজিক জটিলতা তারাশঙ্করের মনকে আন্দোলিত করে। ভয়াবহ মন্বন্তরের চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি রাজনৈতিক জীবনবোধে উজ্জীবিত হন, তার পরেই তিনি রচনা করেন 'মন্বন্তর', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' এর মতো রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুষঙ্গে লিখিত উপন্যাসগুলো। তারাশঙ্করের জীবনবোধের প্রথম থেকেই রাজনীতির উপস্থিতির কথা আমরা জানি। এ জীবনবোধের কারণেই তিনি 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস ত্রয় রাজনৈতিক মহাকাব্যিক অনুষঙ্গে লিখতে সমর্থ হন বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে। তিনি বারবার এসব উপন্যাসে তাঁর স্বভূমি লাভপুরের গ্রাম্যজীবনের কথাই যেন তুলে ধরেছেন।

৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসে যে বহুমাত্রিক অনুষঙ্গের অবতারণা করেছেন তা অন্য লেখকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তিনি তাঁর গল্প- উপন্যাসে ভয়ঙ্কর আদিমতান্ত্রিক ঐতিহ্য, প্রেম, অপ্রেম, পরকীয়া, সৌখিনতা, বিলাসিতা, বৈরাগ্য, বৈষ্ণব সহজিয়াভাব, অবহেলা, প্রবঞ্চনা, তঞ্চকতা, দ্বন্দ্ব- সংঘাত, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, ভাঙা-গড়ার কাহিনী বিধৃত করেছেন নানা অনুষঙ্গে, নানা আঙ্গিকে, নানা ঘরাণায়। ধ্রুপদ আঙ্গিকের গল্প-উপন্যাস ছাড়াও প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বিচ্ছেদ এবং পরকীয়া প্রেমের গল্প- উপন্যাস লিখেছেন তার উদাহরণ 'চাঁপাডাঙার বৌ','জলসাঘর','ব্যর্থ নায়িকা', 'প্রেম ও প্রয়োজন', 'ছলনাময়ী', 'মঞ্জরী অপেরা' ইত্যাদি। তিনি 'সপ্তপদী', 'যতিভঙ্গ' উপন্যাসে অবাঙালী নাগরিক জীবন নিয়ে প্রগাঢ় ভালবাসার গল্প লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। এবার আমার দু'টি প্রিয় উপন্যাসের দিকে একটু নজর দেবো।

৬.

'কবি' উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় রচিত একটি কালজয়ী সাহিত্য। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর `কবি` উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন দরিদ্র ও নিচু পরিবারের এক তরুণের কবি হয়ে ওঠার ঘটনা।'সপ্তপদী' উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় রচিত আরেকটি কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসের কাহিনিতে পাই, মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট কৃষ্ণেন্দু ও রীনা ব্রাউন। রীনা এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। কলেজে ভারতীয় ও এ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ফুটবল টুনামেন্ট হয়। এখানেই কৃষ্ণেন্দু ও রীনা ব্রাউনের মধ্যে বিরোধ শুরু

হয়। যা আরো ছোট ছোট ঘটনায় বাড়তে থাকে। পরে কলেজ ফাংশনে "ওথেলোর-ডেসডিমোনা"য় অভিনয় করতে গিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সব মিলে বলা যায়, তারা শঙ্কর এক কালজয়ী কথাশিল্পী তিনি বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, বাগদী, বোষ্টম, ডোম ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র মানবিক দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। তাঁর দুই পুরুষ, কালিন্দী, আরোগ্য নিকেতন ও জলসাঘর অবলম্বনে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে সৃজনশীল সৃষ্টি কর্মের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরস্কারে ভূষিত হন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' (১৯৪৭) ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৫৬) লাভ করেন। এছাড়া তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৯৫৫), 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' (১৯৫৬), 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' (১৯৬৭) এবং 'পদ্মশ্রী' (১৯৬২) ও 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।